গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সংগ্রহ থেকে
ড: সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে স্মৃতি কথা

১৯৬৪ সালের ১২ই এপ্রিল তদানীন্তন কিউরেটর ক্ষিতিশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সংগরহালয়ের পক্ষ থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার নেন

প্রশ্ন ১ : আচ্ছা সতীশবাবু, গান্ধীজীর সান্নিধ্যে আপনি কি করে এলেন?

উত্তর : আচ্ছা, বলি শোন। অনেক দিনের কথা, তখন আমি বেঙ্গল ক্যামিক্যালের মানিকতলা কারখানার বাড়িতে বাস করি। আলোচনা করিতাম ব্যবসায়ীকার্যে সত্য পথ লইয়া কতটা পথ চলা যায়। কেননা প্রশ্নটা ব্যাপারিক হিসাবেই উঠিয়া পড়ে। কোন স্থানে মাল বিক্রয় হইল, গুদাম বাবুকে কিছু দেওয়া চাই, নচেৎ খারাপ বলিয়া রিপোর্ট হইবে, হয়রানও হইবে এবং অবশেষে বিক্রেতারই হার হইবে। দেওয়াই সুবিধা অথচ খারাপ মাল বেচা হয় নাই। ওজনও ঠিক আছে, তবু দিতে হয়। ক্লেশ হয়, ঘৃণা বোধ হয়, কিন্তু দিতে হয়। যখন এই প্রকার তিক্ত মানসিক অবস্থা তখন সম্মুখে গান্ধীজীর চিত্র আসিল। হ্যা, তবে সত্য পথে চলা যায়। এই মানুষটিকে তখনও দেখি নাই। কিন্তু আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলি। চরখার উন্মাদনা উপস্থিত হয়। এইতো কাজ, এই কাজ করিব। বেঙ্গল ক্যামিক্যাল কর্মীদের মধ্যে চরখা প্রবর্তন করি।

আচার্য রায়ের সহিত কোকনাদ কংগ্রসের প্রদর্শনীতে যাই। গান্ধীজীকে বলি, "তোমার কাজ করিব। বেঙ্গল ক্যামিক্যাল ওয়ার্কস ছাড়িবো"। তিনি বলেন, "কদাচ নয়। আচার্য রায়ের সহিত মহান কার্য করিতেছ; করিতে থাক"। ঠিক কথা। কলকাতায় ফিরিয়া সংকল্প করিলাম যে ছাড়িয়াই দিব। জানা হইতে অজানায়, অভ্যস্ত পথ হইতে অপরিচিত পথে যাত্রা করিতে হইবে। গান্ধীজী কিন্তু মানা করিয়াছেন, করবেনইতো। প্রশ্নের মধ্যেই এই সত্যটা নিহিত ছিল যে আমার সংশয় আছে। যদি সংশয় নাই তবে জিজ্ঞাসা কেন? তিনি নিষেধ করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করাতো ছিলই। নিবিড়ভাবে তাঁহাকে পাইতে লাগিলাম।

প্রশ্ন ২ : আচ্ছা, প্রথমদিকে যখন খাদির উৎপাদন যথেষ্ঠ ছিল না তখন আপনি কি প্রকার অনুভব করতেন?

উত্তর : প্রথম দিকে খাদির কাজের মন্থর গতিতে আমি পীড়া বোধ করি। গান্ধীজী কে লিখি। উত্তর পাই যে আমি যেন পীড়া বোধ না করি। তিনি ইহাও জানান যে, আমরা কেমন করিয়া জানিব যে খাদি চলিবে। ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। অতএব কর্তব্য করিয়া ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া শান্ত হইয়া যাও। মন শান্ত হইল। সে দাহ আর রইল না। বিশ্বাস ছিল সন্তানের জন্য যে উৎকণ্ঠা খাদির জন্য সেই উৎকণ্ঠাবোধ সেবক ধর্ম পালন করার সহায়ক। কিন্তু এখন বিশ্বাস হইল ঈশ্বর নির্ভরতার দ্বারা স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার স্থান পূর্ণ করিতে হইবে। যত চেষ্টার এবং জাগৃতির তীব্রতা থাকুক উহা কমিবে না। বরং অধিক জ্ঞান পূর্ণ চেষ্টা হইবে স্বার্থকতার দিকে অধিক অগ্রসর হইব।

প্রশ্ন ৩ : আচ্ছা দেখুন, প্রিয় পুত্র অনিল যাখন মারা যায় তখন গান্ধীজী আপনাদের কি ভাবে স্বান্তনা দিয়েছিলেন?

উত্তর : একটা ব্যাথার কথা মনে করিয়ে দিলে। আমাদের উনিশ বৎসর বয়সের ছেলে অনিল মারা গেলে আমরা অধীর হইয়া পড়ি। হেমপ্রভা দেবীকে গান্ধীজী লেখেন স্বার্থী ব্যক্তিরাই গুনিয়া গুনিয়া বলে একটি, দুইটি, তিনটি সন্তান, নিস্বার্থের অগুনিত সন্তান, তোমার তাহাই হোউক, তখন সন্তানের শোক শান্ত হয়। ভয় ভাঙ্গিয়া যায়। গার্হস্থ জীবন বা পারিবারিক জীবনের অন্ত হয়।

প্রশ্ন ৪ : আচ্ছা গান্ধীজী বাংলা পরিভ্রমণকালে ট্রেন চলাচলের কি প্রকার ব্যবস্থা আপনারা করেছিলেন সে বিষয়ে একটু বলুন না।

উত্তর : গান্ধীজীর সঙ্গে বাংলায় যখন ঘুরে ঘুরে গেছি তিনি তখন আমাকে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে আমার সঙ্গে চলেছেন। যেখানেই গেছেন লোকে তাঁর প্রতিভীত্ত করতে চেষ্টা করলে তিনি বলেছেন "ঐ সতীশবাবু আমার জেলার বসে আছেন। ওর কাছে যাও যদি সময় ও করে দিতে পারে তবে দেবে"। এইভাবে তাঁকে নিয়ে আমি বাংলায় কোথায় গিয়েছি কোথায় না গিয়েছি। ওঁকে নিয়ে ঘুরতে হতো, অত্যন্ত নীবিড় সান্নিধ্য লাভ হতো। দিনাজপুরে গেছি, বগিখানা কাটা হইয়া থাকিবে, যেন দুই দিন বাদে সেই বগিতেই আবার যাইতে পারি। কলিকাতা হইতে রওনা হওয়ার সময় মিঃ সর্ডে, যিনি ট্রাফিকের ভারপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী ছিলেন, তিনি বললেন তৃতীয় শ্রেণীর বগি দেওয়া যাইবে না। উহাতে যতগুলি সিট থাকিবে রিজার্ভ করিতে তত ভাড়া দিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বগিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম ব্যয় হইবে। গান্ধীজীকে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী করিয়া লউন। বলিলাম, গান্ধীজী বলিলেন টাকার কথা তো নয়। উচ্চ শ্রেণীর গাড়ীতে আমি চড়বো না। তুমি বেশী ব্যয় করিয়াই তৃতীয় শ্রেণীর বগি লও। গেলাম মিঃ সর্ডের কাছে, তিনি নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন বেশ তাই হইবে। কিন্তু আপনি গিয়া গান্ধীজীকে বলুন, তিনিতো রাস্তায় যাইতে ধিকিতে ধিকিতে যান, সে কাজটি কিন্তু করা চলবে না। কাটিয়া রাখা গাড়ি ট্রেনের সর্ব শেষে জোড়া হয়। উহা সাপের লেজের মতো ঝাপটা খাইয়া দুলিয়া দুলিয়া চলিবে। আমরা সমস্ত ট্যুরটায় রিজার্ভেশন করিয়া ব্যবস্থিত করিতে চাহিয়া ছিলাম। পথে যে কোন গাড়িতে গান্ধীজীকে উঠানো কঠিন। শেষবারের কথায় গান্ধীজী নরম হইলেন, বলিলেন, "তবে দ্বিতীয় শ্রেণীই করো।" করা হইল। সর্ডে মহাশয় একখানা প্রথম শ্রেণির গাড়িকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরিণত করিয়া ভাড়া দিয়া দিলেন। তখন গান্ধীজীকে প্রথম শ্রেণিতেই বসাইলাম। দীনাজপুরে নামিলাম। পরে যখন উঠিবো তখন দেখি অন্য বগি, দুইটা কামরায় দ্বিতীয় শ্রেণী। গান্ধীজীকে ট্রেনে শোয়াইয়া দিলাম। কামরা ত্যাগ করার পূর্বে গান্ধীজী আমকে ডাকলেন। তাঁহার কামরায় মহাদেব বা প্যারেলালের সেক্রেটারিদিগকে দিতাম। অপরেরা অন্য কামরায় যাইতাম যাহাতে তাঁহার কামরায় ভীড় না হয়। গান্ধীজী বলিলেন ট্ট "দেখ সতীশবাবু, শোয়াইয়া তো দিলে। এখন শরীর বলিতেছে এতো সে কামরা নয়, সে গদিতো নয়। দেখ শরীরের দাবী সুখ, সুবিধে পাইলে ছাড়িতে চাহে না।" লজ্জিত হইলাম।

প্রশ্ন ৫ : জলপাইগুড়িতে দার্জিলিং মেল আসতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল, এ অবস্থায় আপনারা তখন ট্রেনের কি ব্যবস্থা করেছিলেন?

উত্তর : সে এক বড় রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল। দীনাজপুরের পর জলপাইগুড়ি ত্যাগ করিতে সে বগিতে উঠিবো। ট্রেন আসলে বগি প্ল্যাটফর্মে আনিয়া জুড়িয়া দিবে। সময় উত্তীর্ণ হইল।

ট্রেন আসে না। স্টেশন মাষ্টার বললেন শিলিগুড়িতে লাইনের উপর ধস পড়িয়াছে। ট্রেন আসার কোন ঠিকঠিকানা নাই। ঐ ট্রেনে ঢাকা মেলের সহিত বগি জুড়িয়া গোয়ালন্দ যাইবো। এই ছিল প্রোগ্রাম। সমস্ত ব্যবস্থার বিপর্যয় হয়। গান্ধীজীকে বলিলাম স্পেশাল ট্রেন ব্যবস্থা করিলে সময় মতো পৌঁছানো বা যায়। বলিলেন সম্ভব হইলে তাহাই করো। বলিলেন সাধারণের সহিত আমার ভ্রমণের নির্দিষ্ট দিন। আমি ভাইসরয়ের সহিত যেমন ভাবে সেই নির্দিষ্ট দিন পালন করি সেই ভাবেই পালন করতে হবে। যে টাকা লাগে ব্যয় করো। বলিলাম হাজার তিনেক টাকা লাগতে পারে। বলিলেন খরচ করো। তখন রাত্র আটটা হলেও সার্জেসাহেবকে ফোনে ডাকিয়া পাইলাম। তিনি বলিলেন ব্যবস্থা করিতেছি। ‘ ‘ ষ্টেশন মাষ্টারকে সর্জে হুকুম দিলেন যেখানে ইঞ্জিন শেড আছে, সেই ইঞ্জিন শেডকেও হুকুম দিলেন। গাড়ি জোগাড় করিয়া এক ঘন্টার মধ্যে স্পেশাল দিতে বলিয়া দিলেন। স্পেশাল আসিয়া গেল। ঢাকা মেল তখনও পৌঁছায় নাই। পৌঁছানোর পরে সংযোগ স্থাপিত হইল। সঙ্গে কিন্তু অত টাকা ছিল না। স্পেশাল ট্রেন ভাড়ার বিষয়ে টেলিফোনে সর্জেকে বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন গোয়ালন্দে পৌঁছে টাকাটি দিও। গোয়ালন্দ বন্দরে পৌঁছলে টাকা ধার পেতে কষ্ট হইবে না। ইহা আমি জানতাম। সেই অবস্থাতেই গিয়ে ভোর হতেই গোয়ালন্দ পৌঁছলাম। পূর্বব্যবস্থা মত স্টিমারে কিছু পথ গিয়া মধ্য নদীতে গিয়া লঞ্চে উঠিলাম। অল্প পরে বিক্রমপুর নবাবগঞ্জে পৌঁছলাম। নবাবগঞ্জে হরিপদদের (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়) জাতীয় বিদ্যালয় ছিল ও অন্য গঠনমূলক কর্মকেন্দ্র ছিল।

প্রশ্ন ৬ : আচ্ছা হরিপদ মানে কি আমাদের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়?

উত্তর : আরে হ্যা হ্যা। আমাদেরই হরিপদ চ্যাটার্জী। যিনি এখন এম.পি. হয়ে দিল্লীতে আছেন। ভাড়ার টাকার কথা কিন্তু গান্ধীজী ভোলেননি। তাঁর সফরের জন্য যে চাঁদা তুলেছিলাম ঐ তিনহাজার টাকা তাহার অতিরিক্ত। উহা আমাকে অর্থাৎ খাদি প্রতিষ্ঠানকে দিতে হইবে। গান্ধীজিকে বলিলাম। তিনি বলিলেল - "না। ওরকম হইলে খাদি প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইবে। উহা সংগৃহীত চাঁদা হইতে হরিপদই দিবে, তুমি কোথা হইতে পাইবে।" আমি বলিলাম হরিপদকে বলিব, যদি দেয় তো ভালো। তোমাদিগকে বলছি হরিপদ যে কিপটে সে যে আমাকে দেবে না তা ভালোভাবেই বুঝিয়া গিয়েছিলাম। সে আজও আমাকে ওই টাকাটা দেয়নি।

প্রশ্ন ৭ : আচ্ছা, আপনারা যখন গান্ধীজীকে নিয়ে চাঁদপুরে লঞ্চে এলেন, লঞ্চটাতো খানিকটা দূরে আগেই এসে গিয়েছিল? এ অবস্থায় আপনারা কিরকম বিপদে পড়েছিলেন একবারটি বলুন না।

উত্তর : শোন, এই নবাবগঞ্জ সফরের পর আমাদের প্রফুল্ল বাবু (ড: প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ) ভাগ্যপুরের রামেন্দ্র বাবুদের লঞ্চ আমাদের জন্য জোগাড় করে দিয়েছিলেন, ওই লঞ্চেই আমরা চাঁদপুর পৌঁছলাম। ২রা মে চাঁদপুরে পৌঁছবার নির্দিষ্ট সময় ছিল। জলপথ, ঝড়-ঝাপটা আছে, বিলম্ব হইতে পারে, কতকটা বেশী সময় আনুমানিক ধরা ছিল। রাস্তায় ঝড়ও হয়েছিল বটে, প্রচন্ড সেই ঝড়। আর সেই ঝড়ের মূখে জাহাজ যখন চলে তখন গান্ধীজীর কি ছেলে মানুষর মতো আনন্দ। তিনি বলেন "আমি ডেকে গিয়ে ঝড় টাকে দেখব, ঝড়ের মুখোমুখি হবো।" মহাশয় উনি তো ডেকের উপর গিয়ে ঝড় দেখতে লাগলেন। কেবিনের ভিতরে দাঁড়িয়ে ঝড় দেখছেন। এমন সময় কেবিনের একখানা দরজা ঝট করে খুলে ওঁর বুড়ো আঙুলটাকে দিল চাপা। উফ্ কি যন্ত্রনা। উনি অজ্ঞানের মতো হয়ে বসে পড়লেন। আমরা সকলে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। ডাক্তার ইন্দ্র নারায়ন সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি এসে ইচ্ছা করলেন একটু আইডিন ঐ ক্ষতের জায়গায় লাগিয়ে দিতে। তখন সেখান থেকে

রক্ত ঝরছিল। গান্ধীজীর তখন একটু হুঁশ ফিরেছে। তিনি বললেন "আইডিন দেওয়া নয়।" তাই করা হল, আইডিন দেওয়া গেল না। তিনি সুস্থ হলেন। হয়েই বললেন, "দেখ সব কথাই তো খবরের কাগজে রটে যায়। আমার যে আঘাত লেগেছে এ সংবাদটা যেন কোথাও না বেরোয়। কস্তুরবা বড় ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।" আমরা অবশ্যই ধার্মিকভাবে তাঁর সে নির্দেশ পালন করে ছিলাম। আচ্ছা, এমন বিলম্ব করে গিয়েও আমরা কিন্তু চাঁদপুরে সময়ের অনেক পূর্বেই গিয়ে পৌঁছেছি। তো চাঁদপুরে পৌঁছেছি যখন গান্ধীজী জানলেন নিজের ঘড়িটা দেখে বললেন, "এ তো আগেই পৌঁছে গেছি।" আমি বলি, হ্যা আমরা তো আগেই এসে পড়লাম। গান্ধীজী বললেন "তবে মাঝ নদীতে নোঙর করে রাখ। ঘাটে যেও না। হরদয়াল বাবু (হরদয়াল নাগ) বিব্রত হয়ে পড়বেন।" তাহাই করা হল। দূর হইতে লঞ্চ দেখিয়া শহর তো জাগ্রত হইয়াই পড়িয়াছিল। হরদয়াল বাবুকে বিব্রত হওয়ার থেকে দূরে রাখিবার জন্য গান্ধীজী যে ব্যবস্থা করলেন সেটা কিন্তু বানচাল হয়ে গেল। সমস্ত শহর ঐ নদীর ধারে এসে পড়ল। আমরা কিন্তু সময় মতোই আমদের লঞ্চখানা ঘাটে ভিরিয়ে ছিলাম।

চাঁদপুরে একদিন অপরাহ্নে গান্ধীজীকে লইয়া একটু হাঁটবার ইচ্ছায় বললাম তুমি যাবে? একটু চলিয়া ফিরিয়া আসিবে? বললেন "চল।" চাঁদপুরের ঐ ঝাউ ঘেরা অ্যাভিনিউ দিয়ে চলতে চলতে শান্ত পরিবেশের ভিতরে কথা উঠল মহাভারতের। বললাম, দেখ বাপু, মহাভারতের স্ত্রী, পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে আমর কাছে দ্রৌপদীর স্থান সর্ব্বোচ্চ। তিনিই মহাভারত কাব্যের প্রধান চরিত্র ও নায়িকা। গান্ধীজী বললেন "ঠিক বলেছ।" এই বলিয়া দ্রৌপদীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে করিতে কোথায় পৌঁছিয়া গেলাম। দ্রৌপদীর যে কৃষ্ণের সমর্পণ ছিল উহাই গান্ধীজীর হৃদয়কে আকুণ্ঠ করিয়া শ্রদ্ধাপ্লুত ও সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছিল। দ্রৌপদীর বস্ত্র বাড়িবে না তো কি? বস্ত্র বাড়িবেই। মনে বিশ্বাস হল ঐ যিনি দ্রৌপদীর বস্ত্র বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি আজও আমাদের সাথে আছেন। তিনি আজও আমাদের লজ্জা এমনই করে নিবারণ করে যান। আমরা তাঁরই যেন সবসময় কৃপা প্রার্থী হই। নিজের দম্ভ ত্যাগ করি। দ্রৌপদীর কাহিনীতে আছে দ্রৌপদী বস্ত্র ধরেছিলেন। টেনে ছিলেন। যখন অত্যন্ত টান পড়তে লাগলো বস্ত্র থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে। শাড়ি টানতে লাগল, শাড়ি ফুরায় না। তাদেরই হাত ক্লান্ত হয়ে গেল। ওহ্! কি দৃশ্য। আমি তো বিশ্বাস করি সেই দৃশ্য আজও পৃথিবীতে অভিনীত হচ্ছে। তিনি অমনি করে এসে আমাদের দ্রৌপদীকে বাঁচাচ্ছেন। আমাদিগকে বাঁচাচ্ছেন। যদি আমরা তেমনি করে তাঁর কাছে নিজেদের ফেলে দিই, যেমনি করে দ্রৌপদী ফেলে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আপনাকে। আহা।

প্রশ্ন ৮ : আচ্ছা, গান্ধজীকে নিয়ে আপনারাতো মেদিনীপুরে অনেকবার গিয়েছেন। শেষের দিকে যখন গেলেন সেই অবস্থাটা আমাদের একটু বলুন না।

উত্তর : মেদিনীপুর? হ্যা, মেদিনীপুরের কথা স্মরণ করছি। মেদিনীপুরে বারে বারে গিয়েছি আর আনন্দে ভরপুর আস্বাদ নিয়ে এসেছি। তৃতীয়বার যখন গান্ধজীকে নিয়ে গেলাম তখন শেষবার জেল থেকে বেড়িয়ে তিনি বাংলায় এসেছেন। মেদিনীপুর তো যাওয়া হল। মহিষাদল যাই। সেখানে অন্যান্য কাজ-কর্মের মধ্যে মহিলা সভার ব্যবস্থা ছিল। মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন গৌরব লহিয়াছে আঘাতও তেমনি নিদারুণ সহ্য করিয়াছে। মহিষাদল মহিলা সভায় একটি বিশেষ ব্যাপার নিয়ে মহিলারা হৃদয় খুলে গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলবার অবকাশ খুঁজছিলেন। সেইরকম ব্যবস্থা করা হয়। কেবল মেয়েরাই সেখানে যাবে। আমি তো একরকম মেয়েই হয়ে গেছি। কাজে কাজেই গান্ধীজীর কথা শোনাবার জন্য আমাকে যেতে হয় ঐ মহিলাদের সভায়। আমিও মেয়ের মন নিয়ে সেখানে যাই।

মেয়েরা নিজেদের হৃদয় খুলে গান্ধীজীকে তাঁদের অপমানের কথা শোনাচ্ছিল, চোখের জলে তাদের হৃদয়ের ক্ষত ধৌত করিতেছিল। গান্ধীজীর ঐ এক কথা। গান্ধীজী ফুলে ফুলে ওঠেন, বলেন কেন রুখে দাঁড়ালে না? সাধ্য কি কেউ কিছু করে। গান্ধীজী মহিলাদের হৃদয়ের ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে, উদ্বীবিত করে যে স্বান্তনা, যে প্রেম দিলেন, যে সূচীতা আনিয়ে দিলেন তাহা অবর্ননীয়। কাথাটা ছিল আমাদের এক বাংলার জেলে ওখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কতক গুলো পুলিশী নর পশু লাগিয়ে দেয়। গ্রামের মেয়েদেরকে আলাদা করে পুরুষদেরকে আলাদা করে যা না করবার সব ঘরে ঘরে সেই অপমান দিয়ে দেয়। সেই বেদনায় ক্লান্ত, ব্যাথিত মেয়েরা গান্ধীজীর কাছে তাদের হৃদয়ের ক্ষত খুলে বলল। কি আশ্চর্য। গান্ধীজী জিনিসটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় মেয়ে বাপের কাছে এসে পড়লে যে রকম করে তেমনি বুক বাড়িয়ে মেয়েদেরকে নিলেন; আশ্বস্ত করলেন; মেয়েদেরকে বোঝালেন যে এর থেকে বাঁচা যেত যদি তোমরা দাঁড়িয়ে পড়তে। তোমরা আমার কাছে পুরনো কথা শুনতে চাচ্ছিলে, আজও বাংলার বুকে ওমনি পৈশাচিকতা চলছে। কিন্তু সে কথা থাক।

প্রশ্ন ৯ : আচ্ছা দেখুন, আপনি তো তার পরে কাঁথিতেও গিয়েছিলেন। কাঁথির কথা বলুন না একটু শুনি।

উত্তর : আচ্ছা শোন তাহলে। কাঁথিতেও ঐ সফরেই যাই। কাঁথিই প্রাণের আবেগে কম্পমান ছিল। শাসমলের দেশ কিন্তু শাসমলকে নিকটে না পাওয়াতে গান্ধীজী ছিলেন ম্রিয়মান। জনসভায় আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে গান্ধজী ভষণ দিতে আরম্ভ করতেই যথা অভ্যস্ত আমি অনুবাদ করতে দাঁড়িয়ে গেলাম। কিন্তু এবারে প্রথমতো এক একটি করে বাক্য তিনি উচ্চারণ করবেন আর আমি তার তর্জমা করবো এ নীতি পরিহার করে গান্ধীজী আমকে বললেন "তুমি আমার বক্তব্য শেষ হলে তবে বলবে।" যে বাক্যশ্রোত তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করছিল সেটা ছিন্নছিন্ন ভাবে বাক্যাংশ এক এক বারে একটু করে প্রকট করার মতো নয় বলেই আগে এই নতুন রীতি তিনি অবলম্বন করলেন। সে কি কণ্ঠ, সে কি ভাষা, আধ ঘন্টা ধরে তিনি অনর্গল বলে থামলেন। তারপর আমাকে ঈঙ্গিত করলেন তর্জমা শুনাইতে। কি আশ্চর্য! আমিতো স্মৃতি ধর নই, কিন্তু তিনি শক্তি দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর টেপ রেকর্ডার বানাইয়াছিলেন। আধ ঘন্টা ধরিয়া যা কিছু তিনি বলেছিলেন অনুমাত্র ব্যতিক্রম না করে আমি আবার আর এক আধ ঘন্টায় তার ভাষান্তরিত করে সকলকে শোনালাম। আমার স্মৃতি ও মেধা অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু ঐ অসাধারণ মানুষটি তাঁহার নিজ প্রয়োজনে আমাকে শক্তিমানে উন্নিত করে তাঁর নিজের কাজ করিয়ে নিলেন। আশ্চর্য্য লাগে যে কেমন করে আমি আধঘন্টা ধরে শোনা তাঁর কথা একবারে নির্ভুল হুবুহু আবৃত্তি করে গিয়েছিলাম। আজ পারবো না।

প্রশ্ন ১০ : আচ্ছা আপনারা গান্ধীজীকে নিয়ে বরিশালেও তো গিয়েছিলেন। সেই বরিশালের সম্বন্ধে আমাদেরকে আজকে কিছু একটু বলুন না।

উত্তর : বরিশালে তো অনেক কিছু হয়েছিল। অন্যান্য জায়গায় যেমন লোকে হৃদয় ভরে অভ্যর্থনা করে আর বরিশাল স্বদেশীর বিশেষ পূর্ণক্ষেত্র বরিশালে সেখানকার লোকেরা গান্ধীজীকে এমনি করে নিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ওখানকার অন্যান্য মামুলি যে সমস্ত চলে তাঁর পরিক্রমার সময় ঘটনায় এবং সভা। তাছাড়া একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল সেই কথা তোমাকে শোনাব।

বরিশালে গেলে নাগরিকদের সভায় পতিতারাও যোগ দিতে চায়। তারাও স্বদেশী হয়ে গিয়েছিল কিনা। তারাও বললে গান্ধীজীর সভায় আমরা যাব। গান্ধীজীকে জানিয়ে পাঠায় কেন আমরা গান্ধীজীর কথা শুনবো না? এই ছিল পতিতা মেয়েদের আবদার। গান্ধীজী তাদের সংবাদ পেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন

না সে হয় না। যদি তারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায় তবে নিভৃতে রাত্রে সংগোপনে যেন কেবল সাক্ষাৎ করতে আসে। গান্ধীজীর মনোভাব ছিল পতিতাদিগকে এইভাবে প্রাধান্য দিয়ে সকলের সামনে নিয়ে আসা ঠিক রুচি সঙ্গত এবং ধর্ম সঙ্গত কাজ হবে না। এই সংবাদ যখন গেল তখন ঐ পতিতা মেয়েদের আর উৎসাহ রইল না। গান্ধীর সান্নিধ্য লাভের, আর তাদের দেখা করা ঘটে ওঠে না।

প্রশ্ন ১১ : আচ্ছা আপনারাতো গান্ধীজীকে নিয়ে দার্জ্জিলিংও গিয়েছিলেন সেখানকার কথাটা একটু বলুন না।

উত্তর : শোন গান্ধীজীকে দার্জ্জিলিং এ নিয়ে যান দেশবন্ধু দাশ মহাশয়। দাশ মহাশয়ের সঙ্গে আমার রাজনৈতিকভাবে ছিল বিরোধের সম্পর্ক আর ঘরোয়াভাবে তিনি আমার বেয়াই। সে দিক দিয়ে বেয়াই হিসাবে বড় আদর করতেন। তো দেশবন্ধু গান্ধীজীকে ডেকেছেন, গান্ধজী যাবেন। দার্জ্জিলিং এ আমি বিনা নিমন্ত্রনে কেমন করে অন্যান্য জায়গার মতো এবারেও গান্ধজীর সঙ্গে যাই। আমিতো যেতে পারি না। গান্ধীজীকে বুঝিয়ে বললাম যে তোমার সঙ্গে তো আমি বাপু দার্জ্জিলিং এ যেতে পারবো না। দাশ মহাশয় তো আমাকে ডাকেননি। গান্ধীজী তখন একাই চলে গেলেন। দার্জ্জিলিং এ গিয়ে তিনি সেখানে এন. আর. সরকার মহাশয়ের ভিলাতে উঠলেন। ওখানে পৌঁছবার পর দেশবন্ধু যখন দেখলেন আমি যাইনি তখন গান্ধীজীকে জিজ্ঞেস করলেন ওমুকে কেন আসেনি? তারপর দেশবন্ধু তার করলেন। আমকে যেতেই হবে। তখন আমি ওখানে গিয়ে গান্ধীজীর কাছে ঐ দেশবন্ধুর বাঙলোয় উঠলাম। সেখানে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন উপস্থিত হল। অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের রাজনৈতিক আলোচনা গান্ধীজীর সঙ্গে দাশ মহাশয়ের হল। ফরিদপুরের ঘটনায় দাশ মহাশয় ব্যথিত হয়েছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা চলতে চলতে হিংসা অহিংসার কথা এসে পরে।

পরে, আশ্চর্য্য ঈশ্বরের ঘটনা দেশবন্ধু অন্য দেশবন্ধু হয়ে গেলেন। তিনি গান্ধীজীকে তাঁর অহিংসার পথে একবারে একসঙ্গে সহযাত্রী হওয়ার প্রতিজ্ঞা দিলেন, আমাদিগকে শোনালেন। সহর্ষে দাশমহাশয় আমাকে বললেন আমরা এখন সম্পূর্ণ একসঙ্গে চলবো। বাসন্তী দেবী কত হর্ষান্তিত হলেন একতো আমি কুটুম্ব। একটা ব্যাথা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশী ক্ষেত্রে বিরোধ করতে হয়। এতদিনে এমন একটা জিনিস হল যে আমরা নিবিড় ভাবে দাশ মহাশয় আমি একসঙ্গে গান্ধীজীর কাজ বাংলায় করতে পারবো। কিন্তু কি নিদারুণ দৈব্য তাঁর অব্যবহিত পরেই দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণ করলেন। যে পরিবর্তন হয়েছিল সে কথা আর জগৎকে জানাবার অবকাশ ভগবান দেশবন্ধুকে দিলেন না।

প্রশ্ন ১২ : আচ্ছা এইবার গান্ধীজীর চট্টগ্রাম সফর সম্বন্ধে কিছু যদি বলেন তা হলে বেশ ভাল হয়।

উত্তর : আচ্ছা বলছি। চট্টগ্রামতো গেলাম। সেখানে গিয়েও আমরা দেশপ্রিয়হীন দেশপ্রিয়ের বাড়িতে উঠি। সেকি আতিথ্য শ্রীমতি সেনগুপ্তর। একটা বিষয় দোটানা প্রস্তাব হয়। আমি বলি চলো আমদের সূচিয়াখালি কেন্দ্রে, ওটা তুমি দেখে আসবে প্রার্থনান্তে গ্রাম্য পথে চলতে চলতে তুমি তুলাধূনার বাঁই বাঁই বকর বকর বাঁই বাঁই শব্দ শুনতে থাকবে। তোমার বুক ভরে উঠবে। চলো সূচিয়ায় আমার খাদি কেন্দ্রে। কিন্তু এদিকে এমন আবার হল ঐ দিনই শহরে আরও একটা আহ্বান ছিল যেখানে তাঁকে উপস্থিত হতে হয়। গান্ধীজীর প্রথা ছিল যখন একটা করা বা অন্যটা করা সমতূল্য সেই দ্বিধার সময় তিনি কি করবেন তা ঠিক করবার জন্যে ঐ লটারির আশ্রয় নিতেন। একটা টাকা বৃদ্ধাঙ্গুলির টোকায় উড়িয়ে দিয়ে কোন দিকটা উপরে রহিল উহার সেটার উপর নির্ভর করবে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। লটারী হল। আমার হার হল। গান্ধীজী বলিলেন তবে তুমি এই

সময়টা আমাকে একা রেখে তুমি যে ঠিক করেছিলে কেন্দ্রগুলা একাই ঘুরে এসো। সে প্রকার করা হল।

চট্টোগ্রাম সফরে প্রথমে যাই ফেণী মুন্সির হাট, সেখান থেকে যাই মহাজন হাট। মহাজন হাটের জমিদার পরিবার আমাদের আতিথ্য করেন। ঐটা ছিল খাদি প্রতিষ্ঠানের একটা খাদি কেন্দ্র ও কতকটা প্রচার কেন্দ্র। কাটুনী তাঁতিদের সহিত মিলিয়া ও স্থানীয় নেতৃবর্গকে আনন্দে ডুবাইয়া - পরে বিয়োগের ব্যাথায় ব্যথিত করে গান্ধীজী মহাজন হাট ত্যাগ করেন। পার্টি ছিল বড়। দুই মাইল দূরে স্টেশন। আজও এদের বাড়িতে ছিল একটা হাতি। সেই একটি মাত্র হাতিতেই সকলকে স্টেশনে পৌঁছতে হবে। তা ঠেসাঠেসি হবে বলে আমি গান্ধীজীকে পাঠিয়ে দিই। আর আমি অবশিষ্ট দু চার জন পরবর্তী ট্রিপে যাব বলে ঠিক করি। একখানা মোটর ও ঐ জমিদার বাড়িতে ছিল। কিন্তু সেখানা সেদিন ব্যবহার করার কথা ছিল না। যার মোটর সে জমিদার মহাশয় আমার সঙ্গে শেরবারে যাবেন কথা ছিল। হাতি ফেরে না। উদ্বিগ্ন হইয়া মোটরের সাহায্য নেওয়া ঠিক করলাম। মোটরে চড়ে ছুটলাম স্টেশনে স্টেশনে গিয়ে শুনি গার্ড ও স্টেশন মাস্টার আমার জন্য দশ মিনিট কাল অপেক্ষা করে সে মাত্র ট্রেন ছেড়ে দিয়েছেন। ঐ যে যাচ্ছে দেখা গেল। রেল লাইনের পাশ দিয়ে চট্টগ্রামগামী পঞ্চাশ মাইল সড়ক। তখন আরম্ভ হইল ট্রেনে আর মোটরের রেস। যেমন এক স্টেশন পৌঁছই তখন ঐ ট্রেন চলে গেল। রাস্তা কোথাও কোথাও একটু আঁকা বাঁকা। আমার স্মরণে আসছিল সেই প্রভাত বাবুর ট্রেন ধরার কাহিনী। জাক আবার অস্পষ্ট অসমান গাড়ীর গতি। মোটর গাড়ীটার গতি গরিবী চালে। ট্রেন আর ধরা হয় না। যেমনই স্টেশনের ভিতরে আমরা ঢুকতে যাই তেমনই দেখি ট্রেনখানি ছেড়ে গেল। দুটো চারটে স্টেশন এই করে পল্লা দিয়ে চলতে চলতে শেষে আমি ঠিক করলাম, যে স্টেশনে ধরবার চেষ্টা আর করবো না। সোজা চট্টগ্রাম দিয়ে ট্রেনের পূর্বেই পৌঁছে যাব। সে ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছিল। আমারা ট্রেন চট্টোগ্রাম স্টেশনে পৌঁছবার কয়েক মিনিট পূর্বেই গিয়ে উপস্থিত হয়ে প্ল্যাটফর্মে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করার জন্য হাজির হলাম। গান্ধীজী নিশ্চিন্ত হাসি হেসে বললেন জান তোমার জন্য দশ মিনিট ট্রেন অপেক্ষা করছিল। সমস্ত প্রোগ্রাম আমার হাতে। আমার মধ্যস্ততা করার ব্যবস্থা। সাথে আমি না আসলে তো বিভ্রাট হবেই। কিন্তু এই পুরুষটি নিশ্চিন্ত। আমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত সেতো আসবেই। আর যদি ছেড়ে দিলাম সে নাইবা আসতে পারে, তাইবা কি? গান্ধীজী নেজেই যথা কর্তব্য করে নেবেন। একটুও তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখলাম না। তুমি আসতে পারনি, কি যে মুশকিলে পড়েছিলাম এই রকম কথা সাধারণ লোক ঐ সময়ে বলে তাকে। কিছু না, অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ ভাবে আমাকে নিয়ে নিলেন। আমি তো আসবোই সে তো জানেন। এই রকম ছিল ব্যাপারটা সেদিনকার।

প্রশ্ন ১৩ : আচ্ছা দেখুন ময়মনসিং মহারাজার বাড়িতে আপনারা আতিথেয়তা নিয়েছিলেন গান্ধীজীকে শহরে নিয়ে গিয়ে। সে বিষয়টা একবার আমাদেরকে বলবেন?

উত্তর : ময়মনসিং-এর শহরে গেলে ময়মনসিং-এর মহারাজ কুমার অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত নিজে স্টেশনে এসে সাড়ম্বড়ে অভ্যর্থনা করে আগাগোড়া সাজানো রাস্তা দিয়ে নিজের প্রাসাদে নিয়ে যান। তাঁর প্রাসাদটা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন গান্ধীজীর ব্যবহারের জন্য। তাঁর এই অভ্যর্থনার ভিতরে এই আতিথ্যর ভিতরে প্রেমের অভিষেক বড় বেশী প্রকট হয়ে পড়েছিল। যে ভালোবাসা তিনি গান্ধীজীকে দিয়েছিলেন সে বলা কঠিন। সমস্ত প্রাসাদটা সেখানে কোনও বস্ত্র আছে সবজায়গায় চেয়ার, কুশন, পর্দ, ফরাস, বিছানা সব খাদি মোড়া। আর্দালি পিওন, বরকন্দাজ যারা গান্ধীজীর চোখে পড়বে সব খাদিধারী। এই যে অভ্যর্থনার আন্তরিকতা গান্ধীজী কখনও ভুলতে পারেননি। মনে হয় অনেক দিন

পরে আবার একটা খুব বড় প্রাসাদে গান্ধীজীকে নিয়ে যখন উঠি তখন এই কেমন করে গান্ধীজী ময়মনসিং-এর মহারাজার আতিথ্যের কথা স্মরণ করেছিলেন, সেকথা তোমাকে শোনাবো। অনেক দিন পর একবার যাই ওড়িষ্যা দেশের পাওয়েল কেমেডিতে। পাওয়েল কেমেডির প্রাসাদটা চিল্কা হ্রদে যত ভাইসরয় এসেছেন শিকার করতে গিয়ে ঐ প্রাসাদেই উঠতেন। কাজেই পূর্বাপর সমস্ত ভাইসরয়ের পদধূলির দ্বারা ঐ প্রাসাদটি এবং পরিবেশনটি চিহ্নিত ছিল। সমস্ত উল্টা ময়মনসিং-এর। অর্থাৎ আগাগোড়া বিলেতী ঐস্বর্যের শোভায় পূর্ণ। যেন একটা এই ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের মিউজিয়ামের ভিতরে আমরা ঢুকেছি। সোনা রূপোর জরীর অঢেল সমাবেশ। খাট পালঙ্ক, ডিনার টেবিল, সোনা রূপো, মখমল সব দিয়ে ঢাকা। আতিথ্যের ব্যবস্থা তো খুব করেছিলেন। ভাইসরয়কে যেমনভাবে মহারাজ অভর্থ্যনা করে থাকেন ঠিক সে রকম অভর্থ্যনা না করিলে তাঁর মন উঠিবে না বলিয়া মহারাজ ভাইসরয়ীয় রিসেপসনের ব্যবস্থা গান্ধীজীর জন্য করে রেখেছিলেন।